سورة الذاريات

সূরা যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ
أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَّإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾
وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُّؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾
يَسْئَلُوْنَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ذُوْقُوْا
فِتْنَتَكُمْ ۚ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ
جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَفِيْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ
اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَفِيْٓ أَنْفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَآءِ
رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ
مَآ أَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে

(১) কসম ঝন্‌ঝাবায়ুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদেরকে প্রদত্ত

ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবশ্যম্ভাবী। (৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (৯) যে ভ্রষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? (১৩) যে দিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) আল্লাহ্ভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতি-পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুতি সবকিছু। (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম ঝন্ঝাবায়ুর, অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের (অর্থাৎ বৃষ্টি) অতঃপর মৃদু-চলমান জলযানের, অতঃপর ফেরেশতাদের, যারা (আদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে) বস্তুসমূহ বন্টন করে (উদাহরণত যেখানে যে পরিমাণ রিযিকের মূল উপাদান বৃষ্টির আদেশ হয়, মেঘমালার সাহায্যে সেখানে সেই পরিমাণ বৃষ্টি পৌঁছে দেয়। এমনিভাবে হাদীসে আছে, জননীর গর্ভাশয়ে আদেশানুযায়ী নর ও নারীর আকার তৈরী করে। অতঃপর কসমের জওয়াব বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদেরকে প্রদত্ত (কিয়ামতের) ওয়াদা অবশ্যই সত্য এবং (কর্মসমূহের) প্রতিদান (ও শাস্তি) অবশ্যম্ভাবী (এসব কসমের মধ্যে প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র কুদরতের বলে এসব আশ্চর্য কর্মকাণ্ড হওয়া সর্বশক্তিমান হওয়ার প্রমাণ। অতএব, এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে কিয়ামত সংঘটিত করা মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বাক্যের কসম খাওয়া হয়েছে সেসবের তফসীর দুররে-মনসুরের এক হাদীস দ্বারা পরে বর্ণিত হবে। বিশেষভাবে এসব বস্তুর কসম খাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এতে সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেমতে ফেরেশতা ঊর্ধ্বজগতের সৃষ্ট এবং বাতাস ও জলযান অধঃজগতের সৃষ্ট এবং মেঘমালা শূন্য জগতের সৃষ্ট। অধঃজগতের দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি চোখে দৃষ্টিগোচর হয় এবং অপরটি হয় না। এরূপ দুটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত সম্পর্কিত এক বিষয়বস্তুতে খোদ আকাশের কসম খাওয়া হয়েছে; যেমন উপরে ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কিত বস্তুসমূহের ছিল। অর্থাৎ) কসম আকাশের, যাতে (ফেরেশতাদের চলার) পথ আছে; (যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ অতঃপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা (অর্থাৎ সবাই কিয়ামত সম্পর্কে) বিভিন্ন কথাবার্তা বলছ (কেউ সত্য বলে এবং কেউ মিথ্যা

বলে। আল্লাহ্ বলেন ঃ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ — আকাশের কসম দ্বারা সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাত আকাশে অবস্থিত এবং আকাশে পথও আছে। কিন্তু যে সত্য বিষয়ে মতবিরোধ করবে, তার জন্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এসব মতবিরোধকারীদের মধ্যে) সে-ই (কিয়ামতের বাস্তবতা ও প্রতিদানের বিশ্বাস থেকে) মুখ ফিরায়, যে (পুরোপুরিভাবে পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে) বঞ্চিত ঃ (যেমন হাদীসে আছে, من حرمه فقد حرم الخير كله — অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সব পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। মতবিরোধকারীদের অপরপক্ষ অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে সত্য বলে, তাদের অবস্থা এরই মুকাবিলা থেকে জানা যায় যে, তারা পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত নয়। অতঃপর বঞ্চিতদের নিন্দা করে বলা হচ্ছে ঃ) যারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে, তারা ধ্বংস হোক, (অর্থাৎ যারা কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই কিয়ামতকে অস্বীকার করে) যারা মূর্খতাবশত উদাসীন। (তারা ঠাট্টা ও ত্বরান্বিত করার ভঙ্গিতে) জিজ্ঞাসা করে ঃ প্রতিফল দিবস কবে হবে? (জওয়াব এই যে, সেদিন হবে) যেদিন তারা অগ্নিদগ্ধ হবে (এবং বলা হবে ঃ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (এই জওয়াবটি এমন, যেমন ধরুন, একজন অপরাধীর জন্য ফাঁসিতে ঝুলানোর আদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোকা ফাঁসির তারিখ না বলার কারণে আদেশ-টিকে কেবল মিথ্যাই মনে করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, ফাঁসি কবে হবে? এই প্রশ্নটি যেহেতু হঠকারিতা প্রসূত, তাই জওয়াবে তারিখ বলার পরিবর্তে একথা বলাই সঙ্গত হবে যে, সেদিন তখন আসবে, যখন তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর অপরপক্ষ অর্থাৎ মু'মিন ও সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের সওয়াব বর্ণিত হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা জান্নাতে প্রস্রবণে থাকবে এবং তারা (সানন্দে) গ্রহণ করবে; যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। (কেননা) তারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৎকর্মপরায়ণ ছিল। (সুতরাং هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ এর ওয়াদা অনুযায়ী তাদের সাথে এই ব্যবহার করা হবে। এরপর তাদের সৎকর্মপরায়ণতার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) তারা (ফরয ও ওয়াজিব পালন করার পর নফল ইবাদতে এতই লিপ্ত থাকত যে) রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত (অর্থাৎ বেশীর ভাগ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করত এবং এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ইবাদতকে তেমন কিছু মনে করত না; বরং) রাতের শেষ প্রহরে (নিজেদেরকে ইবাদতে ত্রুটিকারী মনে করে) তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (এ হচ্ছে দৈহিক ইবাদতের অবস্থা)। এবং (আর্থিক ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের (সবার) হক ছিল [অর্থাৎ এমন নিয়মিত দান করত, যেন তাদের কাছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের পাওনা আছে।এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য যাকাত নয় এবং এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, জান্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং এখানে যাকাত নয় এমন দান বোঝানো হয়েছে। (দুররে-মনসুর) আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, জান্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল; বরং জান্নাতের উচ্চস্তরের অধিকারীদের

কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কাফিররা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই অতঃপর এর প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে] বিশ্বাসকারীদের (অর্থাৎ বিশ্বাস করার চেষ্টাকারীদের) জন্য (কিয়ামতের সম্ভাব্যতা বিষয়ে) পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন (ও প্রমাণ) রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (রয়েছে ; অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অবস্থাও কিয়ামতের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। এসব প্রমাণ যেহেতু সুস্পষ্ট, তাই শাসানির ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা কি (মতলব) অনুধাবন করবে না ? (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত বিশ্বাস না থাকার কারণে তোমরা কিয়ামতেই বিশ্বাসী নও। এসম্পর্কে কথা এই যে) তোমাদের রিযিক এবং (কিয়ামত সম্পর্কে) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেসব (অর্থাৎ সেসবের নির্দিষ্ট সময়) আকাশে (লওহে মাহ্ফুযে) লিপিবদ্ধ আছে। (এর নিশ্চিত জ্ঞান পৃথিবীতে কোন উপযোগিতার কারণে নাযিল করা হয়নি। সেমতে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ আয়াতেও নির্দিষ্ট সময় বলা হয়নি। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, বৃষ্টির নির্দিষ্ট দিন কারও জানা থাকে না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যখন রিযিক নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়, তখন নির্দিষ্ট তারিখ জানা না থাকার কারণে কিয়ামত না হওয়া কিরূপে জরুরী হয়ে যায় ? এরূপ প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করার কারণেই مَا تُوعَدُونَ এর সাথে رِزْقُكُمْ-কে সংযুক্ত করা হয়েছে। অতএব যখন কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ নেই এবং হওয়ার প্রমাণ আছে, তখন) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, এটা (অর্থাৎ কর্মফল দিবস) সত্য (এবং এমন নিশ্চিত) যেমন তোমরা কথাবার্তা বলছ। (এতে কখনও সন্দেহ হয় না, তেমনি কিয়ামতকেও নিশ্চিত জ্ঞান কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। এক. اَلذَّارِيَاتِ ذَرْوًا দুই. اَلْحَامِلَاتِ وِقْرًا তিন. اَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا এবং চার. اَلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا—

ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রা) ও আলী মোর্তাযা (রা)-র উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ذاريات বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝন্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حاملات وقرا -এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جاريات يسرا বলে পানিতে সচ্ছল গতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مقسمات امرا এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসূর)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ---حبك-শব্দটি حبكة-এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حبك বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে حبك-এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই ঃ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ---বাহ্যত এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন 'বিভিন্ন রূপ উক্তির' অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে।---(মাযহারী)

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ---افك-এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো।

عنه-এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। এক. এই সর্বনাম দ্বারা কোরআন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্য বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

দুই. এই সর্বনাম দ্বারা قول مختلف (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কোরআন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ---خراص-এর অর্থ অনুমানকারী এবং অনুমানভিত্তিক

উক্তিকারী। এখানে সেই কাফির ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'মিথ্যাবাদীর দল' বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।---(মাযহারী) কাফিরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মু'মিন ও পরহিযগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ ঃ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

يَهْجَعُونَ— শব্দটি هجوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মু'মিন পরহিযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহিযগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে ما শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশ নামায ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা)-র মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ জাফর বাকের (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।---(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী (র)-র বর্ণনামতে আহ্নাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই ঃ আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পোঁছে না। কারণ, তারা রাত্রিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশী করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। আল্লাহ্র রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পোঁছে এবং না আল্লাহ্র রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথে খাপ খায়। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কোরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে ঃ

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا —অর্থাৎ যারা ভালমন্দ ক্রিয়াকর্ম মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা) বলেন : বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল : হে আবূ উসামা, আল্লাহ্ তা'আলা পরহিযগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ), আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ, আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জওয়াবে বললেন :

طوبى لمن رقد اذا نعس واتقى الله اذا استيقظ —তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করে না।---(ইবনে কাসীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না; বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত 'থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গোনাহ্ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন :

يا ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام -

লোক সকল। তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামায পড়, যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।---(ইবনে কাসীর)

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত : وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ অর্থাৎ মু'মিন পরহিযগারগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। اسحار শব্দটি سحر-এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠ প্রহর। এই প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে : وَالْمُسْتَغْفِرِينَ —

بِالْأَسْحَارِ সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না)। তিনি ঘোষণা করেন : কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবূল করব ? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব ?---(ইবনে কাসীর)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহিযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করার বাহ্যত কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোন্ গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে ?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার অধ্যাত্ম জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ---(মাযহারী)

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ঃ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ—سائل বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে তার অভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাকে সাহায্য করে। محروم বলে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মু'মিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না ; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজখবর নেয়।

বলা বাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন-মুত্তাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না ; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধনসম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না ; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে ঃ

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ—অর্থাৎ বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে

কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফিরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে)। অতঃপর মু'মিন পরহিযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফির ও কিয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লেখিত إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীর মাযহারীতে একেও মু'মিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مُوقِنِينَ-এর অর্থ আগের مُتَّقِينَ-ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগবাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক-একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ায় হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা, কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ — এ স্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্ট বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক-একটি অঙ্গকে আল্লাহ্‌র কুদরতের এক-একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা মানবীয় বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো-বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেযাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্ পাকেরই কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فتبارك الله احسن الخالقين

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়---স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ্কে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ—অর্থাৎ আকাশে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর ও তফসীরের সার-সংক্ষেপে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ 'লওহে-মাহফুযে' লিপিবদ্ধ থাকা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে্-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিযিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করারও চেষ্টা করে তবে রিযিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড় দেবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিযিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। --(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রিযিক অর্থ বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্য জগৎসহ উর্ধ্বজগৎ বোঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। مَا تُوعَدُونَ বলে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি বোঝানো হয়েছে।

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ —অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

وَهُوَ مُلِيمٌ ۝٤٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝٤١ مَا
تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۝٤٢ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ
لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝٤٣ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّٰعِقَةُ
وَهُمْ يَنظُرُونَ ۝٤٤ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ۝٤٥
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝٤٦

(২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ সালাম, তখন সে বললঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক! (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বললঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বললঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বললঃ আমি তো বৃদ্ধা বন্ধ্যা। (৩০) তারা বললঃ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৩১) ইবরাহীম বললঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমান-দার ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলঃ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে

পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার কাছে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? ['সম্মানিত' বলার এক কারণ এই যে, তারা ফেরেশতা ছিল। ফেরেশতাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ বলা হয়েছে। অথবা এর কারণ ছিল এই যে, ইবরাহীম (আ) স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে সম্মান করেছিলেন। বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে 'মেহমান' বলা হয়েছে। কারণ, তাঁরা মানুষের বেশে আগমন করেছিল। এই বৃত্তান্ত তখনকার ছিল,] যখন তারা (মেহমানরা) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করল, তখন ইবরাহীম (আ)-ও (জওয়াবে) বললেনঃ সালাম। (আরও বললেনঃ) অপরিচিত লোক (মনে হয়। বাহ্যত তিনি একথা মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। কারণ, এরপর ফেরেশতাদের কোন উত্তর উল্লেখ করা হয়নি। একথা সরাসরি তাদেরকে বলে দেওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে যে, আপনাদেরকে তো চিনলাম না। আগন্তুক মেহমানরা এর কোন জওয়াব দেয়নি এবং ইবরাহীম (আ)-ও জওয়াবের অপেক্ষা করেন নি। মোটকথা এই সালাম ও কালামের পর) তিনি গৃহে গেলেন এবং একটি মোটা গোবৎস ভাজা (لقوله تعالى بعجل حنيذ) নিয়ে হাযির হলেন। তিনি গোবৎসটি তাদের সামনে রাখলেন। [তারা ফেরেশতা ছিল বিধায় আহার করল না। তখন ইবরাহীম (আ)-এর সন্দেহ হল এবং] বললেনঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (এরপরও যখন আহার করল না, তখন) তাদের সম্পর্কে তিনি শংকিত হলেন (যে এরা শত্রু কিনা, কে জানে; যেমন সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে)। তারা বললঃ আপনি ভীত হবেন না। (আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা। একথা বলে) তারা তাঁকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল, যে জ্ঞানীগুণী (অর্থাৎ নবী) হবে। [কেননা, মানবজাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জ্ঞানী হন। এখানে হযরত ইসহাক (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এসব কথাবার্তা চলছিল, ইতিমধ্যে] তাঁর স্ত্রী (হযরত সারা, যিনি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন, لقوله تعالى وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ সন্তানের সংবাদ শুনে) চিৎকার করতে করতে সামনে এলেন। অতঃপর ফেরেশতারা যখন তাঁকেও এই সংবাদ শোনাল لقوله تعالى فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ —তখন আশ্চর্যান্বিতা হয়ে) মুখ চাপড়িয়ে বললেনঃ (প্রথমত) আমি বৃদ্ধা (এরপর) বন্ধ্যা। (এমতাবস্থায় সন্তান হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার বটে;) ফেরেশতারা বললঃ (আশ্চর্য হবেন না لقوله تعالى أَتَعْجَبِينَ) আপনার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি

প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (অর্থাৎ বিষয়টি বাস্তবে আশ্চর্যের হলেও আপনি নবী-পরিবারের লোক, জ্ঞানে-গুণে ধন্য। আল্লাহ্‌র উক্তি জেনে আশ্চর্য বোধ করা উচিত নয়)। ইবরাহীম (আ) (নবীসুলভ দূরদর্শিতা দ্বারা জানতে পারলেন যে, সুসংবাদ ছাড়া তাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য আছে। তাই) বললেন ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ কওমে লূতের) প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করি---যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে (অর্থাৎ অদৃশ্য জগতে) চিহ্নিত আছে। (সূরা হূদে তা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ যখন আযাবের সময় ঘনিয়ে এল, তখন) সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (এতে বোঝানো হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের আর কোন গৃহই ছিল না। কারণ, যার অস্তিত্ব আল্লাহ্ জানেন না, তা মওজুদ হতেই পারে না)। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেথায় (চিরকালের জন্য) একটি নিদর্শন রেখেছি এবং মূসা (আ)-র বৃত্তান্তেও নিদর্শন রয়েছে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (অর্থাৎ মো'জেযা)-সহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে পারিষদবর্গসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ সে হয় যাদুকর, না হয় উন্মাদ। অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করলাম)। সে শাস্তিযোগ্য কাজই করেছিল এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর অশুভ বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। এই বায়ু যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল (অর্থাৎ ধ্বংসের আদেশপ্রাপ্ত যেসব বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত,) তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ [অর্থাৎ সালেহ্ (আ) বলেছিলেন ঃ] কিছুকাল আরাম করে নাও। (অর্থাৎ কুফর থেকে বিরত না হলে কিছুদিন পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে)। অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (অর্থাৎ এই আযাব খোলাখুলিভাবে আগমন করল)। অতএব, তারা না দাঁড়াতে সক্ষম হল (বরং উপুড় হয়ে পড়ে রইল لقوله تعالى جاثمين -) এবং না কোন প্রতিকার করতে পারল। ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়েরও ঐ অবস্থা হয়েছিল। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوْا سَلَامًا - قَالَ سَلَامٌ — ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلَامًا ইবরাহীম (আ) জওয়াবে বললেন سَـــلَامٌ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে।

কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারীর ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ—مُنْكَر শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্‌কেও مُنْكَر বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তাই মনে মনে বললেন ঃ এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

رَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ—رَاغَ শব্দটি رَوْغ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা এ কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি ঃ ইবনে কাসীর বলেন এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি ; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই যবেহ্ করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না ; বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। তৃতীয়ত, আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না। বরং বলেছেন أَلَا تَأْكُلُوْنَ—অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ—অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্রসমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খেত, তার ক্ষতি সাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ—صَرَّة-এর অর্থ অসাধারণ আওয়ায। কলসের শব্দকে صَرِير বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর

গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ প্রথমত আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে ? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল ঃ كَذٰلِكِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ বছর ছিল।---(কুরতুবী)

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহ্র ফেরেশতা। অতএব তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন ? তারা হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়---মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ---অর্থাৎ কংকরগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে লূতের আযাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। এটা প্রস্তর বর্ষণের পরিপন্থী নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে-লূতের পর মূসা (আ)-র সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরাউনকে যখন মূসা (আ) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ ফিরাউন মূসা (আ)-র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনা-বাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আ)-এর বাক্যে اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ - এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর 'আদ সম্প্রদায়, সামূদ এবং পরিশেষে কওমে নূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ

الْمٰهِدُوْنَ ۝ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۝ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(৪৭) আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম! (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতএব আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫১) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এমনিভাবে, তাদের পূর্ব-বর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছেঃ যাদুকর, না হয় উম্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুত তারা দুষ্ট সম্প্রদায়। (৫৪) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মু'মিনদের উপকারে আসবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (নিজ) ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতাশালী! আমি ভূমিকে বিছানা (স্বরূপ) করেছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (অর্থাৎ এতে কত চমৎকার উপকারিতা নিহিত রেখেছি। আমি প্রত্যেক বস্তু দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছি, এই প্রকারের অর্থ বিপরীত পক্ষ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কোন-না-কোন সত্তাগত ও অসত্তাগত গুণ এমন রয়েছে, যা অন্য বস্তুর গুণের বিপরীত। ফলে এক বস্তুকে অপর বস্তুর বিপরীত গণ্য করা হয়; যেমন আকাশ ও পাতাল, উত্তাপ ও শৈত্য, মিষ্ট ও তিক্ত, ছোট ও বড়, সুশ্রী ও কুশ্রী, সাদা ও কাল এবং আলো ও অন্ধকার)। যাতে তোমরা (এসব সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে তওহীদকে) হৃদয়ঙ্গম কর। (হে পয়গম্বর! তাদেরকে বলে দিন, যখন এসব সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার একত্ব বোঝায়, তখন) তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের উচিত, এসব প্রমাণের ভিত্তিতে) আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, (তদুপরি) আমি তোমাদের (বোঝানোর) জন্য আল্লাহ্‌র

পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী (যে, তওহীদ অমান্য করলে শাস্তি হবে। কাজেই তওহীদের বিশ্বাস আরও জরুরী। আরও স্পষ্ট করে বলছি ঃ) তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (তওহীদের বিষয়বস্তু শব্দান্তরে বর্ণনার কারণে সতর্ককরণের তাকীদার্থে বলা হচ্ছে ঃ) আমি তোমাদের (বোঝানোর) জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ আপনি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট সতর্ককারী কিন্তু আপনার বিরোধী পক্ষ এত মূর্খ যে, তারা আপনাকে কখনও যাদুকর, কখনও উন্মাদ বলে। অতঃপর আপনি সবর করুন। কেননা, তারা যেমন আপনাকে বলছে,) এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা (সবাই অথবা কতক) বলেছে ঃ যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (অতঃপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মুখে একই কথা উচ্চারিত হওয়ার কারণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হচ্ছে ঃ)তারা কি একে অপরকে এ বিষয়ের ওসীয়ত করে এসেছে ? (অর্থাৎ এই ঐকমত্য তো এখন, যেমন একে অপরকে বলে গেছে, দেখ যে রসূলই আগমন করে, তোমরা তাকে আমাদের মতই বলবে। অতঃপর বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, একে অপরকে এ বিষয়ে কোন ওসীয়ত করেনি। কেননা, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সাথে দেখাও করেনি। বরং ঐকমত্যের কারণ এই যে) তারা সবাই অবাধ্য সম্প্রদায় (অর্থাৎ অবাধ্যতায় যখন তারা অভিন্ন, তখন উক্তিও অভিন্ন হয়ে গেছে)। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (অর্থাৎ তাদের মিথ্যাবাদী বলার পরোয়া করবেন না)। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। বোঝাতে থাকুন কেননা, বোঝানো (যাদের ভাগ্যে ঈমান নেই, তাদেরকে জব্দ করার কাজে আসবে এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে, সেই) ঈমানদারদেরকে (এবং যারা পূর্ব থেকে মু'মিন, তাদেরকেও) উপকার দেবে। (মোট কথা, উপদেশ দানের মধ্যে সবারই উপকার আছে। আপনি উপদেশ দিয়ে যান এবং ঈমান না আনার কারণে দুঃখ করবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কিয়ামত ও কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রিসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ রয়েছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ — أَيْد শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তফসীরই করেছেন।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। আবূ বকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (র) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহ্র দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।---(কুরতুবী)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

(৫৬) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ্ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা, শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। (৫৯) অতএব এই জালিমদের প্রাপ্য তাই, যা তাদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই তারা যেন আমার কাছে তা তাড়াতাড়ি না চায়। (৬০) অতএব কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রকৃতপক্ষে) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি (এখন আনুষঙ্গিকভাবে ও ইবাদতের পূর্ণতার খাতিরে জিন ও মানব সৃষ্টির ফলে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়া আয়াতের পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে কতক জিন ও কতক মানব দ্বারা ইবাদত সংঘটিত না হওয়াও এই বিষয়বস্তুর প্রতিকূলে নয়। কেননা, لِيَعْبُدُونِ ---এর সারমর্ম হচ্ছে তাদেরকে ইবাদতের আদেশ করা ---ইবাদত করতে বাধ্য করা নয়। শুধু জিন ও মানবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এখানে ইচ্ছাধীন ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ইবাদত বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাদের মধ্যে ইবাদত আছে বটে; কিন্তু তা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু তথা জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির ইবাদত ইচ্ছাধীন নয়। মোট কথা এই যে, তাদের কাছে আইনগত দাবী হল ইবাদত। এছাড়া) আমি তাদের কাছে (সৃষ্ট জীবের) জীবিকা দাবী করি না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ্ নিজেই সবার রিযিকদাতা (কাজেই সৃষ্ট জীবকে রিযিকদানের দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই), শক্তিশালী,

পরাক্রান্ত। (অপারকতা, দুর্বলতা ও অভাব-অনটনের কোন যৌক্তিক সম্ভাবনাও নেই। কাজেই আহার্য চাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, যখন ইবাদতের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং ইবাদতের প্রধান অঙ্গ ঈমান, তখন এরা এখনও শিরক ও কুফরকে আঁকড়ে থাকলে শুনে রাখুক) এই জালিমদের প্রাপ্য শাস্তি আল্লাহ্র জ্ঞানে তাই (নির্ধারিত), যা তাদের (অতীত) সমমনাদের প্রাপ্য (নির্ধারিত) ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধী জালিমের জন্য আল্লাহ্র জ্ঞানে বিশেষ বিশেষ সময় নির্ধারিত আছে। প্রত্যেক অপরাধীকে পালাক্রমে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয় ---কখনও ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে এবং কখনও শুধু পরকালে)। অতএব তারা যেন আমার কাছে তা (অর্থাৎ আযাব) তাড়াতাড়ি না চায়, (যেমন এটাই তাদের অভ্যাস। তারা সতর্কবাণী শুনে মিথ্যারোপ করার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি আযাব চাইতে থাকে)। অতএব (যখন পালার দিন আসবে, যার মধ্যে কঠোরতর দিন হচ্ছে প্রতিশ্রুত দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, তখন) কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। (খোদ এই সূরাও এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা শুরু হয়েছিল ঃ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ এবং ইতিও এই প্রতিশ্রুতির উপর করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে সূরার অলংকারগত সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্য দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন কাজ করা অসম্ভব। দুই. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মু'মিন জিন ও মু'মিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। বলা বাহুল্য, যারা মু'মিন, তারা কমবেশী ইবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, সুফিয়ান প্রমুখ তফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এই আয়াতের এক কিরা'আত مُؤْمِنِين শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

এই কিরা'আত থেকে উপরোক্ত তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জওয়াবে

তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আল্লাহ্‌র আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন ; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক আল্লাহ্‌প্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সরল তফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। 'প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ' করার অর্থ অধিকাংশ আলিমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়। مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ—অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জন্য। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড় লোকই হোক না কেন---কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পেছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুযী-রোযগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذَنُوبًا— শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যে-কেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذنوب শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালার কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে! কাজেই তাড়াহুড়া করো না।